

**“দ্য বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন রেগুলেশন ফর ডিজিটাল, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড ওটিটি প্লাটফর্মস ২০২১” শীর্ষক খসড়া
নীতিমালার ওপর টিআইবির মতামত ও সুপারিশসমূহ**

ক্রমিক নং	ধারা	মতামত ও সুপারিশ
১.	১	(ক) প্রয়োগের ক্ষেত্র ও ভাষাগত অস্পষ্টতা: দীর্ঘ শিরোনাম থেকে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ডিজিটাল মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ওটিটি (ওভার দ্য টপ) প্লাটফর্মসমূহের কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করাই হবে খসড়া নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য। ধারা ১(৩)-এ বলা হয়েছে যে, এটি মূলত “ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা প্রদানকারী” যারা অনলাইনে কনটেন্ট, সেবা, অথবা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সাপোর্ট প্রদান করবে তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, খসড়া নীতিমালায় “ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা প্রদানকারী”, “সেবা” অথবা “অ্যাপ্লিকেশন” এর মতো শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলোর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়ন না হওয়ায় এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের মর্জির উপর নির্ভর করতে হবে। এছাড়া, বিদেশি মালিকানাধীন বা বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার বাইরে অবস্থানকারী সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি বা সহযোগিতার ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নেই, অথচ নীতিমালার প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে সমধর্মী বিদেশি প্লাটফর্মসমূহ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অর্ন্তভুক্তির ইঙ্গিত রয়েছে। ফলশ্রুতিতে নীতিমালাটির এই অস্পষ্টতা ও সর্বব্যাপী ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনায় দেশের বাইরের সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনিশ্চয়তা সৃষ্টির পাশাপাশি অনাহত বিতর্ক তৈরির ঝুঁকি রয়েছে। সুপারিশ: খসড়া নীতিমালাটির প্রয়োগ শুধুমাত্র বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং “ইন্টারনেটভিত্তিক সেবাপ্রদানকারী”, “সেবা” অথবা “অ্যাপ্লিকেশন” - এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞায়ন জরুরি, অন্যথায় অপব্যবহারের সুযোগ থেকে যাবে। (খ) নীতিমালাটি কার্যকর হওয়ার সময়: ধারা ১(২) অনুযায়ী, “বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর ওয়েবসাইটে নীতিমালাটি যেদিন আপলোড (প্রকাশ করা) হবে, সেদিন থেকেই এটি কার্যকর বলে ধরে নেওয়া হবে। টিআইবি নিম্নোক্ত দুইটি কারণে ধারাটির বিপক্ষে আপত্তি তুলছে: প্রথমত: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (২০০১ আইন)-এর ৯৯ ধারায় বলা হয়েছে, প্রয়োজন দেখা দিলে বিটিআরসি (১) সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে এবং (২) প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে; সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারবে। যেহেতু মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের নির্দেশনায় খসড়া নীতিমালাটি প্রস্তুত করা হয়েছে, তাই নীতিমালাটি কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের অনুমতির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অতএব, আমরা মনে করছি নীতিমালাটি চূড়ান্ত করার পূর্বে সংশ্লিষ্টগণ বিধিবদ্ধ আইনগত বিষয়সমূহ ও বিচারিক প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন, যাতে করে নীতিমালাটির কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনাহত জটিলতার সৃষ্টি না হয়। দ্বিতীয়ত: যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ সাপেক্ষে সরকারিভাবে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমেই সাধারণত প্রণীত আইন বা নীতিমালা কার্যকর হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। তথাপি, প্রক্রিয়াধীন খসড়া নীতিমালাটি কার্যকরভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত দুই বছর সময় প্রদান করা উচিত। যাতে করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ নীতিমালাটি পরিপূর্ণভাবে অনুধাবনের পাশাপাশি কোনো ধরনের আইনি জটিলতা ছাড়াই তাদের অভ্যন্তরীণ নীতিমালা, পরিচলনপদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। তাছাড়া, নীতিমালাটির কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিটিআরসির অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি ও আধুনিকায়নের জন্যেও উল্লিখিত সময় জরুরি বলে আমরা মনে করছি।

		সুপারিশ: ধারা ১(২) এভাবে উল্লেখ করতে হবে যে, খসড়া নীতিমালাটি কার্যকর হবে- (ক) মহামান্য হাইকোর্টের সম্মতি (খ) ২০০১ আইন- এর ৯৯ ধারায় বর্ণিত প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসৃত হওয়া সাপেক্ষে এবং (গ) প্রজ্ঞাপন জারির কমপক্ষে দুইবছর অতিবাহিত হলে।
২.	৩	(ক) অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়সমূহ: আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি, এই খসড়া নীতিমালাটি মূলত করা হয়েছে, অনলাইনের কনটেন্ট ও অনলাইন সেবাপ্রদানকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু, ধারা ৩- এ নীতিমালাটির উদ্দেশ্য যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা যতখানি না ইন্টারনেট বা অনলাইন সম্পর্কিত তার চেয়ে অধিকমাত্রায় টেলিকমিউনিকেশন ও সম্প্রচার সম্পর্কিত। তথাপি, অনলাইনে যে প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে সাধারণত কনটেন্ট পরিবেশন করা হয়, তা কোনো অর্থেই প্রচলিত টেলিকমিউনিকেশন বা সম্প্রচার মাধ্যমের অনুরূপ নয়। তাই, নীতিমালাটির উদ্দেশ্য বর্ণনায়ও তার প্রতিফলন থাকা উচিত। এক্ষেত্রে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, খসড়া নীতিমালার ধারা-৪ ও ৫ এ একমুখীনতার প্রতিফলনই ঘটেছে। কেননা, ধারা দুইটিতে নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ ও নিবন্ধনের যে সকল পূর্বশর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তা মূলত প্রচলিত টেলিকমিউনিকেশন সেবাপ্রদানকারী (ইন্টারনেট সেবাপ্রদানকারী ও মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর) প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে আরো দূরদর্শী ও সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া উচিত। কেননা, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ প্রচলিতধারার টেলিকমিউনিকেশন ও সম্প্রচার মাধ্যম নিয়ন্ত্রণের ধারণার বশবর্তী হয়ে “অনলাইন সেবার” মূলভাবনার বিপরীত নীতি গ্রহণে সচেষ্ট হতে পারে। সুপারিশ: ধারা-৩ “নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্যসমূহ” বর্ণনার ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়সমূহের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। যেমন- (ক) অনলাইনের ক্ষতিকর দিক নিয়ন্ত্রণ; (খ) ক্ষতিকর কনটেন্ট থেকে ভোক্তা, নিত্য ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়া জনগোষ্ঠী (নারী, শিশু, গণমাধ্যমকর্মী, সরকার বা কর্তৃপক্ষের সমালোচনাকারী)- কে সুরক্ষা প্রদান (গ) সুবিন্যস্ত ও সুস্বচ্ছলভাবে কনটেন্ট পরিবেশনের স্বার্থে “সেবাপ্রদানকারীর” স্বজনশীলতাকে সুরক্ষা প্রদান; (ঘ) ব্যক্তি অধিকার, বাক ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ন্যায় মৌলিক অধিকারসমূহের সুরক্ষা প্রদান (ঙ) বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার ভিতরে ও বাইরে অবস্থানকারী উভয় ধরনের সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে সমভাবে সুযোগ প্রদান ও মূল্যায়ন (চ) সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকারের বিধান নিশ্চিত করা; (ছ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যবহারকারীদের স্বার্থ রক্ষায় অনলাইন কনটেন্ট - এর ক্ষেত্রে অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণের সুযোগ নিশ্চিত করা; এবং (জ) মেধাস্বত্ব মালিকানা/অধিকার- এর সুরক্ষা প্রদান।
৩.	৪, ৫, ৬.০২ ও ৭.০২	(ক) অপ্রয়োজনীয়/অবাস্তবিক নিবন্ধন শর্তাবলী: খসড়া নীতিমালায় “অনলাইন সেবাপ্রদানকারী” সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সনদ বা অনুমতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে সব শর্তাবলী আরোপ করা হয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে, তা মূলত টেলিকমিউনিকেশন মাধ্যমসমূহের নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা থেকেই করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। নিম্নোক্ত কারণে নিবন্ধন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্তাবলী অগ্রহণযোগ্য ও যুগোপযোগী নয় বলে মনে হয়েছে- প্রথমত: শর্ত অনুযায়ী ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে, আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে অবস্থান এবং প্রচলিত ধারার নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করেই আবেদন করবে। যেমন- বিটিআরসিতে আবেদন করার ক্ষেত্রে “কর প্রদানকারী শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)”, “ট্রেড লাইসেন্স” ও “মূল্য সংযোজন কর সনদ” থাকতে হবে বলা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে, বিদেশে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পদ্ধতি বা নীতি অনুসৃত হবে, তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এরফলে, সংশ্লিষ্ট অগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহগুলোর উল্লিখিত নিয়ম মেনে আবেদন করার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি রয়েছে। দ্বিতীয়ত: নিবন্ধনের জন্য শর্তাবলী আরোপ করার ক্ষেত্রে মূলত ইন্টারনেটভিত্তিক সেবাপ্রদানের ধারণা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে অবস্থানের বাধ্যবাধকতা, এই দুইয়ের মধ্যে যে কোনো যোগসূত্র নেই, তা অনুধাবনের ঘাটতি রয়েছে। প্রচলিত ধারার টেলিকমিউনিকেশন সেবাপ্রদান করার ক্ষেত্রে যেমন স্থানিক অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি প্রশিক্ষিত জনবলেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কিন্তু এই দুইটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ছাড়াই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের ভৌগলিক সীমানার বাইরে অবস্থান করে এবং তৃতীয় কোনো পক্ষের সহযোগিতা ব্যতীত কেবলমাত্র বিদ্যমান টেলিকমিউনিকেশন কাঠামো ব্যবহার করেই কাজিত সেবা প্রদানে সক্ষম। সুতরাং, খসড়া নীতিমালার উল্লিখিত শর্তাবলীতে “ইন্টারনেটভিত্তিক সেবাপ্রদানের” ধারণাকে যেভাবে নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানা দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা ভ্রান্তিমূলক, অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অযৌক্তিক। তাছাড়া, “ইন্টারনেট সেবাপ্রদানকারী” প্রতিষ্ঠানসমূহ যেভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, সে ধারণাও পরিপন্থী। এরফলে স্থানীয় পর্যায়ের ভোক্তার জন্য দেশের

	ভৌগলিক সীমানার বাইরের প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, যা নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তিকে বাধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসার খরচ বৃদ্ধি ঘটাবে। তৃতীয়ত: বিশেষ করে খসড়া নীতিমালার ধারা-৫ এ বিটিআরসিকে যেভাবে “নিবন্ধন সনদ” বাতিল, স্থগিত ও প্রত্যাহার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, এরফলে- (ক) বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার বাইরে অবস্থানরত প্রতিষ্ঠানসমূহকে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসা পরিচালনাকে বাধাগ্রস্ত করবে। এমনকি অনেক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়বে, যা দেশে দীর্ঘমেয়াদি বিদেশি বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করতে পারে। একইসাথে, আমাদের স্বরণ রাখা উচিত যে, “২০০১ আইন” টি মূলত করা হয়েছিলো দেশিয় প্রেক্ষাপটে টেলিকমিউনিকেশন সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য। তাই আমাদের আহ্বান থাকবে যে, টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসের অনুরূপ মূল্যায়ন ও ধারণার বশবর্তী হয়ে “ইন্টারনেটভিত্তিক সেবাপ্রদানকারী” প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একই মানদণ্ড ও শর্তাবলী আরোপ থেকে বিরত থাকা। কেননা, মাধ্যম দুটির সেবার ধরন ও ব্যবসা পরিচালন পদ্ধতি একবারেই আলাদা। তাই “ইন্টারনেটভিত্তিক সেবাপ্রদানকারী” প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আইনকাঠামো তৈরির নামে “২০০১ আইন” এর অযৌক্তিক প্রতিফলন কোনোভাবেই কাম্য নয়। এক্ষেত্রে মাধ্যম দুটির বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন ও অনুধাবন জরুরি। চতুর্থত: রেজিস্ট্রেশনের উল্লিখিত শর্তসমূহ সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ঝুঁকির কারণ হতে পারে। উল্লেখ্য, ২০০১ আইনের ধারা ৬৪ এবং ৬৬এ (ধারা ১০ এবং ১২এ উল্লেখ করা হয়েছে) এর অধীনে সর্বোচ্চ ৩০০ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের বিধানের কথা বলা আছে। যেখানে আইনের প্রায়োগিক দিক বিবেচনায় না নিয়ে এবং বাস্তবতার বিপরীতে কর্তৃপক্ষের জন্য পর্যায়ক্রমে এবং আনুপাতিক পদ্ধতির মতো শর্তের উল্লেখ না থাকায় কোম্পানিগুলোর জন্য অসম জরিমানার ঝুঁকি তৈরী হতে পারে। যে কোনো আইন প্রয়োগ ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে এর ন্যায্যনুগ ও নীতিসম্মত দিকটি অবশ্যই বিবেচনা রাখা উচিত। বিশেষ করে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই তা অপরাধের সমানুপাতিকভাবে হওয়া উচিত। অর্থাৎ আইনের প্রয়োগ হবে প্রতিরোধমূলক, কোনোভাবেই তা যেন প্রতিশোধমূলক না হয়। উপরন্তু, এই প্রবিধানটি বর্তমানে বলবৎ অন্যান্য আইনের পরিপূরক না হয়ে যুগপৎ প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলশ্রুতিতে একজন স্থানীয় মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানকে শুধু ২০০১ আইনের অধীনেই নয়, বরং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২ এবং পেনাল কোড-১৮৬০ এর মতো আইনের অধীনেও দায়বদ্ধ থাকতে হবে। খসড়া প্রবিধানে পদ্ধতিগত সুরক্ষাসমূহের অনুপস্থিতি এবং অপরাধ ও শাস্তির অসমানুপাতিক বিধান থাকায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত হতে নিরুৎসাহিত করতে পারে। পঞ্চমত: স্থানীয় রেজিস্ট্রেশনের বাধ্যবাধকতা দেশের ভৌগলিক সীমানার বাইরে অবস্থানকারী সংস্থাগুলির ওপর নজরদারি বৃদ্ধিসহ স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনকে বাধাগ্রস্ত করার ঝুঁকি তৈরি করবে। বিশেষ করে, ২০০১ আইনের ৯৭এ ধারায় জাতীয় নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে যে কোনো ব্যক্তিকে “আটক, রেকর্ড বা তথ্য সংগ্রহ” করতে সরকার জাতীয় নিরাপত্তা, গোয়েন্দা এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা করতে পরিষেবা প্রদানকারীদের বাধ্য করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু, ২০০১ আইন অনুযায়ী বিটিআরসিকে পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়ার ব্যাপকতর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা বা আইনগতভাবে সিদ্ধ কী-না, সে আলোচনা ব্যতিরেকে প্রদত্ত এই ক্ষমতার কারণে অনেক বিদেশী কোম্পানি বাংলাদেশে নিবন্ধিত হতে তা বা বিটিআরসি-তে নিবন্ধন করতে ইচ্ছুক নাও হতে পারে; কারণ- আদালতের আদেশ ছাড়া শুধুমাত্র সরকারি সংস্থার অনুরোধে গ্রাহকদের তথ্য প্রকাশ করতে কোম্পানিসমূহ রাজি না-ও হতে পারে। এই ধরনের প্রকাশের বাধ্যবাধকতা কেবল সংবিধানের ৩৯ এবং ৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলোকেই লঙ্ঘন করবে না, বরং কোম্পানিগুলো যে দেশে অবস্থিত সেই দেশসমূহের বিদ্যমান আইন-নীতি এবং তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনেও বাধ্য করতে পারে। (খ) স্থানীয় প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে প্রয়োগের ঝুঁকি: ধারা ৬ দশমিক ২ এবং ৭ দশমিক ২ অনুযায়ী, প্রত্যেক মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানকে একজন আবাসিক অভিযোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তা, কমপ্রায়েন্স অফিসার এবং এজেন্ট নিয়োগ করতে হবে। যা অনাবাসিক পরিষেবা প্রদানকারীদের ওপর অত্যধিক ব্যয় ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে। যেখানে আবাসিক কর্মকর্তা এবং প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে নীতিমালাটির নিবর্তনমূলক ধারাসমূহ প্রয়োগের ঝুঁকি তৈরি করবে। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে যে- ২০০১ আইনের ৭৬ ধারা অনুযায়ী, নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে দোষী বলে গণ্য করা হয়, যা দেশের বিদ্যমান আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। উদাহরণ হিসেবে “মুসলিমউদ্দিন বনাম বাংলাদেশ” মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে ([৭ BLD (AD) ১] ‘ক্রিমিনাল ট্রায়াল পরিচালনার মূল ভিত্তিই হবে যে- অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নির্দোষ বলে বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য কোনো ধরনের প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বাধ্য নন। আর অভিযোগ প্রমাণের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব মূলত যিনি অভিযোগ উত্থাপন
--	---

		করেছেন তার বা প্রসিকিউশনের ওপর। এক্ষেত্রে মামলাটি বিচারিক আদালত বা উচ্চ আদালত যেখানেই বিচারাধীন থাকুক না উভয় অবস্থাতেই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নির্দোষ হিসেবেই বিবেচিত হবেন।’ একইভাবে, হাকিম আলী বনাম রাষ্ট্র [১১ BLD ৩৭১] মামলায় বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের পর্যালোচনা অনুযায়ী, ‘ক্রিমিনাল মামলার বিচারকার্য পরিচালনার মূল ভিত্তিই হচ্ছে যে- অপরাধীর অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বত্র তিনি নির্দোষ বলেই গণ্য হবেন।’ সুতরাং খসড়া নীতিমালায় আলোচ্য নির্বর্তনমূলক ধারাটির সন্নিবেশন মূলত দেশের প্রচলিত আইনি ব্যবস্থা ও উচ্চ আদালতের রায়ের সুস্পষ্ট লক্ষ্যন। ফলশ্রুতিতে এটির প্রয়োগ ঘটলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা এবং প্রতিনিধিদের নিজেদেরকেই নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে নতুবা কোম্পানির মতো একই শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এক্ষেত্রে নীতিমালায় একটি সুস্পষ্ট, আইনানুগ ও যৌক্তিক বিধানের অন্তর্ভুক্তি জরুরি। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও সুখ্যাতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আত্ম হারাতে পারে। সুপারিশ: স্থানীয়ভাবে অন্তর্ভুক্তি বা নিবন্ধন, আবাসিক কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রতিনিধি নিয়োগের বাধ্যবাধকতাসংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ খসড়া নীতিমালা থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে।
8.	৬.০১ (ঘ)	(ক) কন্টেন্ট অপসারণসংক্রান্ত বিধানের ব্যাপক বিস্তৃত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণতা: ধারা ৬.০১ (ঘ) অনুসারে, বিটিআরসি বা আদালত দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা বা নিরাপত্তা, শালীনতা বা নৈতিকতা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, বা মানহানির মত কারণে কন্টেন্ট অপসারণের আদেশ জারি করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ ৭২ ঘন্টার মধ্যে নির্দেশিত কন্টেন্ট অনলাইন থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এই শর্ত নিম্নলিখিত কারণে আশঙ্কা তৈরি করেছে— প্রথমত: উল্লিখিত ধারায় যে সকল ধারণার অবতারণা করা হয়েছে, আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, এর সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর নির্বর্তনমূলক, অমৌক্তিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়োগ ঘটছে। সর্বোপরি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এর প্রয়োগ সঠিক হচ্ছে কী-না, তারও কোনো মানদণ্ড নেই। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ৫৭- ধারায় এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮- এর অধীনে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিমত প্রকাশের জন্য অসংখ্য গ্রেপ্তারের ঘটনা দেখেছি, যা আবার প্রচলিতঅর্থে আইনসিদ্ধ হিসেবেও পরিগণিত হয়েছে। তথাপি আইন দুটির ব্যবহার এতটাই নির্বর্তনমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঘটেছে যে, সম্প্রতি আইনমন্ত্রী ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধনসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন। এই আইনের অধীনে দায়ের করা অনেক মামলাই যথাযথ প্রমাণের অভাবে বা পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে শেষ পর্যন্ত খারিজ হয়ে গেছে। সুতরাং এই ধারাটির খসড়া নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তি, প্রক্রিয়াগত সুরক্ষার অবর্তমানে পূর্বের ন্যায় অপব্যবহারের অব্যাহত দ্বার খুলে দেওয়ার শামিল বলে আমরা মনে করছি। দ্বিতীয়ত: উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী, বিটিআরসি বা আদালতের আদেশের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কন্টেন্ট অপসারণে সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রদানকারীর অপরাগতা বা অসম্মতির মতো ঘটনা ঘটলে, যে হারে জরিমানার বিধান করা হয়েছে, তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য। তৃতীয়ত: সাংবিধানিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে, অনলাইন কন্টেন্টের নিয়ন্ত্রণ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের অধীনে নিশ্চিত করা বাক্ ও মতপ্রকাশ এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপের শামিল। যদিও বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ নিরঙ্কুশ নয়, তথাপি সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় আরোপিত বিধি-নিষেধের সীমা যুক্তিসঙ্গত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষকরে বিরুদ্ধ মতামত, কর্তৃপক্ষের সমালোচনা কিংবা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের সমালোচনা বা অজনপ্রিয় মতামত অপসারণের উদ্দেশ্যে এর অপব্যবহার ঘটে, তাহলে তা সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই এর সম্ভাব্য অপব্যবহার রোধে সুরক্ষামূলক বিধানের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া নির্দেশিত কন্টেন্ট অপসারণের জন্য যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তা স্থানীয় মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলোকে জরিমানা ও শাস্তির এড়ানোর ভয়ে “সেফ সেন্সরশিপ” আরোপের পাশাপাশি অনেক যৌক্তিক কন্টেন্ট পরিবেশন থেকেও বিরত রাখতে পারে। যা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকে প্রকটতর করে তুলতে পারে। চতুর্থত: প্রতিটি কন্টেন্ট অপসারণের অনুরোধ অবশ্যই যৌক্তিক হতে হবে। প্রসঙ্গত বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতের রায়ের এমন অনেক নজির রয়েছে যার বিচারিক এবং প্রশাসনিক আদেশের যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এর মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো—

		(ক) আমান নিটিং লিমিটেড বনাম বাংলাদেশ সরকার: ‘যে কোনো প্রশাসনিক নির্দেশনা অবশ্যই যৌক্তিক এবং নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার স্বার্থে নথিভুক্ত হতে হবে। যে কোনো আধা-বিচারিক বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনো ধরনের নির্দেশনা প্রদান করে থাকে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যৌক্তিক কারণসমূহ নথিভুক্ত হওয়া জরুরি। কেননা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ন্যায়বিচার পাওয়ার মৌলিক অধিকারের জায়গা থেকে কোন ধরনের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘনের কারণে শান্তির সম্মুখীন হয়েছেন, তা জানানোর অধিকার যেমন তাঁর রয়েছে, তেমনি কর্তৃপক্ষ যে নির্দেশ প্রদান করেছেন, সেক্ষেত্রেও আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে কী-না, তা পরিষ্কার হওয়া জরুরি।’ (খ) মো. আকমল হোসাইন ও অন্যান্য বনাম কুলসুম নেসা: ‘আলোচ্য ক্ষেত্রে বিভক্ত জ্যেষ্ঠ সহকারী বিচারক যে বিতর্কিত রায় প্রদান করেছেন, তা অযৌক্তিক। প্রদত্ত রায়ের কোনো আইনি ভিত্তি নেই। তাই সঙ্গত কারণেই অত্র মহামান্য আদালত পূর্নবিবেচনার এখতিয়ার থেকে বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়টি পূর্নবিবেচনা করছে। কেননা রায়টি অযৌক্তিক ও বেআইনি হয়েছে। বিভক্ত বিচারক রায়টি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকটভাবে আইনের ব্যত্যয় ঘটানোর পাশাপাশি ন্যায়বিচারের মৌলিক ধারণা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, ফলশ্রুতিতে অত্র মহামান্য আদালত তার এখতিয়ার থেকে রায়টি পূর্নবিবেচনার জন্য গ্রহণ করছে। একইসঙ্গে বিচারক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়টি খারিজ হয়েছে বলে রায় প্রদান করা হল।’ (গ) আবদুল কুদ্দুস খান সালাফি বনাম রাষ্ট্র: ‘অবশ্য উল্লেখ্য যে, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার এবং চিন্তা ও বাকস্বাধীনতা সংবিধানের ৩৭ থেকে ৩৯ অনুচ্ছেদ প্রদত্ত অলঙ্ঘনীয় মৌলিক অধিকার। সুতরাং, উপরে বর্ণিত অধিকারগুলিকে সীমিত করার যে কোনো আদেশ অবশ্যই সাংবিধানিক বিধি-বিধানের মধ্যে প্রণীত আইন দ্বারা যুক্তিযুক্ত এবং সমর্থিত হতে হবে।’ সুপারিশ: সঙ্গত কারণেই আলোচ্য ধারাটির ক্ষেত্রে কিছু সংশোধন আনা জরুরি, যেমন- (ক) যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে কনটেন্ট কাটছাঁটের ঘটনা রোধে প্রক্রিয়াগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা; (খ) নির্দেশনা অনুযায়ী কনটেন্ট অপসারণে অপারগ বা ব্যর্থ হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে পর্যায়ক্রমিক ও আনুপাতিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে; (গ) নির্দেশিত কনটেন্ট অপসারণের যে সময়সীমা উল্লেখ করা হয়েছে, তা বাদ দিয়ে বরং “স্থানীয় মধ্যবর্তী প্রতীক নির্দেশিত কনটেন্ট ভালোভাবে পর্যালোচনা করে দেখবে এবং কোনো বেআইনি উপাদান শনাক্ত করতে পারলে যত দ্রুত সম্ভব তা মুছে ফেলবে বা বাদ দিবে” এই বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; (ঘ) নীতিমালায় কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত কনটেন্ট অপসারণের যে সময়সীমা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কেবলমাত্র আদালত কর্তৃক যৌক্তিক কারণসহ বেআইনি বলে ঘোষিত কনটেন্ট – এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করতে হবে।
৫	৭.০৩	(ক) মূল বার্তা প্রেরক সনাক্তকরণ ও সাংবিধানিক অধিকার: ধারা ৭.০৩ অনুযায়ী, বার্তা পরিষেবা প্রদানকারীকে আদালত বা বিটিআরসির নির্দেশে বার্তার প্রেরক বা এর উৎস সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করতে হবে। কার্যত, এই বিধানটির জন্য বার্তা পরিষেবার মাধ্যমে প্রেরিত প্রতিটি বার্তা, ছবি, ভিডিও এবং অন্যান্য যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংরক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সেবাপ্রদানকারী প্রত্যেক সেবাগ্রহণকারী বা ব্যবহারকারীকে যাতে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়, তার কার্যকর পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ বিটিআরসি বা আদালতের নির্দেশনা মেনে মূল বার্তা প্রেরককে খুঁজে পেতে পারে। বর্তমানে বেশিরভাগ বার্তা পরিষেবা প্রদানকারী মাধ্যমসমূহ মূলত এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন পদ্ধতি ব্যবহার করছে। কিন্তু আলোচ্য ধারাটি বলবৎ হলে বার্তা পরিষেবা প্রদানকারীকে এই এনক্রিপশন ব্যবস্থা ভাঙতে হবে, অর্থাৎ ব্যক্তি অধিকার ক্ষুণ্ণ করে “প্রেরক-প্রাপকের” বাইরে তৃতীয় পক্ষের কাছে সংশ্লিষ্টদের পরিচয় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা তৈরি হবে। এতে করে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার “ব্যক্তি গোপনীয়তা” সরাসরি লঙ্ঘিত হবে। বৈশ্বিক পর্যায়ে কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদ ও শিশু পর্নোগ্রাফি রোধে কর্তৃপক্ষের এ জাতীয় বিধি-নিষেধ আরোপের বিষয়টি স্বীকৃত। কিন্তু তা কোনোভাবেই বিরুদ্ধ মতামত, কর্তৃপক্ষের সমালোচনা বন্ধ বা বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির ওপর নজরদারি করার ক্ষেত্রে বৈধতা প্রদান করে না। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বব্যাপী সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারি বৃদ্ধির প্রবণতা থেকেই “ব্যক্তি গোপনীয়তা” ধারণার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি অধিকার রক্ষায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ তার ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত আলাপচারিতা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সরকার বা কর্তৃপক্ষের নজরদারির বাইরে রাখতে “এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন” পদ্ধতি চালু করেছে। আলোচ্য ধারাটি সংযোজনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হচ্ছে যে, বার্তা আদান-প্রদানের পরিষেবা ব্যবহার করে যাতে করে কেউ গুজব, মিথ্যা, বানোয়াট ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়িয়ে দিতে না পারে, তা নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু ২০০১ সালের আইনের (ওপরে উল্লিখিত) ধারা ৯৭(ক) এর দিকে তাকালে এটি প্রতিয়মান হয় যে, এই জাতীয় নিবর্তনমূলক ধারাসমূহ মূলত সরকার বা কর্তৃপক্ষের জন্য ক্ষমতা অপব্যবহারের অবিরত সুযোগ করে দেয়। যা স্বাধীনভাবে বাক ও মতপ্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। ফলশ্রুতিতে ধারাটি বলবৎ থাকলে অনেক ব্যবহারকারীই নিরাপত্তা

		ও হেনস্তার শিকার হওয়ার ভয়ে ব্যক্তিগত মেসেজিং পরিষেবাগুলোতে নিজেদের ভাব প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবেন। ভারতে, নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ এইরকম বিধানকে চ্যালেঞ্জ করেছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশেও এ জাতীয় ঘটনা ঘটানো সম্ভাবনা থাকছে। তাছাড়া, আলোচ্য ধারায় যে নিবর্তনমূলক নিয়ন্ত্রণের বিধানাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে, তা আমাদের সংবিধানের ৩৯ ও ৪৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও পরিপন্থি। অধিকন্তু, ধারাটি বলবৎ থাকলে অনেক মেসেজিং সার্ভিস বাংলাদেশে তাদের সেবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। সুপারিশ: খসড়া বিধিমালাটির সংশোধনীতে উল্লেখ করতে হবে যে, (১) পরিস্থিতি মোকাবেলায় যৌক্তিক কারণে ও আদালতের আদেশে কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট তথ্যের উৎস প্রকাশ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকবে; (২) পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক ও পদ্ধতিগত কিছু বিধানের অন্তর্ভুক্তিকরণ; যাতে করে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যৌক্তিক বিচারবোধের জায়গা থেকে ব্যক্তি-অধিকার ক্ষুণ্ণ না করেই আপত্তিকর কনটেন্ট প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন এবং তাদেরকে আদালতের আদেশের মতো কঠিন সিদ্ধান্তের সম্মুখীন না হতে হয়। সর্বোপরি, অযাচিত বিতর্ক এড়িয়ে চলার স্বার্থে বিটিআরসিকে কনটেন্ট অপসারণের নির্দেশনা প্রদানের মতো নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।
৬.	১০ ও ১২	(ক) শান্তি ও সাংবিধানিক অধিকার: খসড়া বিধিমালায় উল্লিখিত শান্তির বিধান (২০০১-এর আইন দ্বারা সমর্থিত) সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার খর্বের ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে। ২০০১ আইনের ৬৪ ও ৬৬(ক) ধারায় উল্লেখিত বিধানাবলীতে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে- পুরোনো জরিমানা ব্যবস্থা বিদ্যমান; অপরাধের তুলনায় শান্তির ধরন পর্যায়ক্রমিক ও সমানুপাতিক না হওয়ায় সংবিধানের ৩১ ও ৩৯ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ঘটেছে। এছাড়া, ২০০১ আইনের ৭৭ ধারায় উল্লেখিত বিধি-নিষেধ মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানের (যেমন-ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কর্তৃপক্ষ) কর্মচারী ও প্রতিনিধিদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থি। তাই স্বাভাবিক কারণেই, মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তাদের স্থানীয় কর্মচারীদের ওপর বিদ্যমান আইনগত ঝুঁকি থাকার ফলে দেশের বাইরের পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিটিআরসিতে নিবন্ধিত হতে অনগ্রহী করার পাশাপাশি বাংলাদেশে পরিষেবা প্রদান থেকে বিরত রাখতে পারে। (খ) সুরক্ষাবলয়ের অনুপস্থিতি: ব্যবহারকারী কর্তৃক তৈরিকৃত কনটেন্ট শুধুমাত্র প্রচার ও প্রকাশে সহায়তা প্রদান করার কারণে মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানের জন্য শান্তির যে বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে ও তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে সুরক্ষাবলয়ের অনুপস্থিতি সংবিধান পরিপন্থি। মধ্যবর্তী মাধ্যমের জন্য সুরক্ষা বিধান না করা হলে, জরিমানা এড়াতে তারা “আত্ম-নিয়ন্ত্রণের” জায়গা থেকে কনটেন্ট পরিবেশনে অতিরিক্ত মাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করবে, এরফলে স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে অযাচিত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে, যা সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আমাদের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য এ জাতীয় সুরক্ষাবলয় থাকা খুবই জরুরি। সুপারিশ: আমরা মনে করছি, (১) যদি কোনো সেবাদানকারী বিধান অনুযায়ী নির্দেশ পালনে ব্যর্থ বা অপারগ হয়, সেক্ষেত্রে শান্তি প্রদানে পর্যায়ক্রমিক ও আনুপাতিক পদ্ধতি অনুসরণ বাঞ্ছনীয়, এক্ষেত্রে তাই ২০০১ আইনের ৬৪, ৬৬ক ৭৭ ধারাসমূহের সংশোধন জরুরি। একইসাথে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে দায়িত্ব পালনের কারণে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান বাতিল করতে হবে; (২) শুধুমাত্র পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে, আরোপিত বিধি-নিষেধ পালনে ব্যর্থ হলে শান্তির বিধান রেখে ব্যক্তি-ব্যবহারকারীর-কনটেন্ট অপসারণে অপারগতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের দায়ী না করা; (৩) মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত সুরক্ষা নিশ্চিতের স্বার্থে খসড়া নীতিমালায় যথাযথ বিধানের অন্তর্ভুক্তিকরণ করতে হবে; এবং (৪) নির্দিষ্ট কোনো একটি নির্দেশনা বা বিধান পালনে অপারগ হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একাধিক আইনের প্রয়োগ বন্ধে নীতিমালায় সুস্পষ্ট বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৭.	০৮ ও ০৯	(ক) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা: খসড়া নীতিমালার তৃতীয়ভাগে, অনলাইন কিউরেটেড কন্টেন্ট, নিউজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কন্টেন্ট ও ওয়েবভিত্তিক অনুষ্ঠানাদি প্রকাশ ও প্রচারের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্ব থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবেই অবহিত যে, মন্ত্রণালয় সম্প্রচারমাধ্যমসহ অন্যান্য গণমাধ্যমের প্রতি সাধারণত কোন ধরনের কর্তৃত্ব প্রয়োগে অভ্যস্ত। তাই সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব চর্চা করবে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলা না থাকায়, ভিডিও-অন-ডিমান্ড ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের সার্বক্ষণিক নজরদারি ও সেন্সরশিপ আরোপের

	ঝুঁকি রয়েছে। তাছাড়া, এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, খসড়া নীতিমালাটি মূলত বহুল বিতর্কিত “সম্প্রচার নীতিমালা”- এর বিধি-নিষেধের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা সঙ্গতকারণেই ভালো কিছুই দৃষ্টিগোচর নয়। (খ) এখতিয়ারসংক্রান্ত প্রশ্ন: আমরা লক্ষ্য করেছি যে, একই বিষয় নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং বিটিআরসি পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। বিটিআরসি আলোচ্য খসড়া নীতিমালাটি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় “ওভার দ্য টপ (ওটিটি) কনটেন্টভিত্তিক পরিষেবা প্রদান এবং পরিচালনা নীতিমালা-২০২১ (খসড়া) তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। যদিও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জনগণের মতামত চাওয়া বা কারও সঙ্গে আলোচনা করার বিষয়টি উল্লেখ নেই। তাই আমাদের উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে- প্রথমত: একই বিষয়ের ওপর বিটিআরসি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় পৃথকভাবে কেন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে- যা কোনোভাবেই বোধগম্য হয়নি। দ্বিতীয়ত: একই ক্ষেত্রে দুটি পৃথক সংস্থা প্রণীত নীতিমালা কীভাবে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা হবে, সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনাবলী উল্লেখ করা হয়নি। সর্বোপরি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ইন্টারনেটভিত্তিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথেষ্ট আইনি সক্ষমতা আছে কী-না, সেটি একটি বড় প্রশ্ন। বৈশ্বিক পর্যায়ে গুটিকয়েক দেশ, উদাহরণ হিসেবে হাঙ্গেরি- এর কথা বলা যায় যেখানে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান প্রচলিত ধারার গণমাধ্যমসহ, টেলিকমিউনিকেশন, ইন্টারনেট সেবা এবং ইন্টারনেটভিত্তিক পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম ও প্রতিষ্ঠানসমূহের দেখভাল করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন, কেননা ২০১৮ সালের নভেম্বরের ‘রুলস অব বিজনেস’ সংশোধনের মাধ্যমে অটিটি পরিষেবাসমূহ (দেশের ও বাইরের টেলিযোগাযোগ পরিষেবা, ডেটা কমিউনিকেশন এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবাগুলো) নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে, যার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান বিটিআরসি। অন্যদিকে, চলচ্চিত্র, সম্প্রচার মাধ্যমসমূহসহ ও প্রচলিত ধারার গণমাধ্যমসমূহ দেখভালের দায়িত্ব তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে প্রদান করা হয়েছে। যদিও ইন্টারনেটভিত্তিক প্ল্যাটফর্মসমূহ সম্প্রচার মাধ্যমসমূহ যে পরিষেবা গ্রহণ করছে, তা নিয়ন্ত্রণ করার এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আপাতদৃষ্টে ইন্টারনেটভিত্তিক পরিষেবাগুলোর সঙ্গে সম্প্রচার পরিষেবাগুলো একত্রিত হওয়ার কারণে উভয় কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে তাদের এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু, একদিকে নীতিগতভাবে নিয়ন্ত্রণের একক কর্তৃত্ব তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেমন সমীচীন হবে না, তেমনি বিদ্যমান আইনকাঠামো অনুযায়ী তথ্য মন্ত্রণালয় চাইলেই সীমা অতিক্রম করে অন্যান্য ক্ষেত্রে তার বৈধ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবে না। সুপারিশ: খসড়া নীতিমালাতে যে বিষয়গুলো থাকা উচিত বলে আমরা মনে করছি- (১) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে; (২) প্রচলিতধারার সম্প্রচার মাধ্যমসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধানসমূহ যেন অনলাইন পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা না হয়, তা নিশ্চিত করা; এবং (৩) বিভিন্ন অনলাইন পরিষেবাসমূহের দেখভালের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কোন কর্তৃপক্ষ পালন করবে, তা স্পষ্ট করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পরিচালন পদ্ধতি ও কার্যক্রমের ধরনভেদে বিভিন্ন মাধ্যম এবং পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যপ্রণালী বিবেচনায় নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং বিটিআরসিকে যৌথভাবে যুগোপযোগী একক নীতিকাঠামো তৈরি করতে হবে/নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
--	--